দৈনিক সংবাদ

78

তারিখ 23 FEB 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

# মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার বর্তমান হালচাল ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা

ধীরেশ নাগ

শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড। আর এ মেরুদন্ডকে মজবুত করার জন্য মাধ্যমিক পর্যায় একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। একজন শিক্ষার্থীর ভিত্তি এ পর্যায়ে এসেই শক্তিশালী হতে থাকে। কাজেই এ পর্যায়ে শিক্ষাদান ও গ্রহণ প্রক্রিয়া যদি ফলপ্রসূ না হয় তবে শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ শিক্ষাজীবন হয়ে উঠে নড়বড়ে। বর্তমান বাস্তবতায় যেটি সন্দেহাতীতভাবে আমাদেরকে অনুভব করিয়ে দিচ্ছে বিজ্ঞজনেরা নির্দ্বিধায় বলতে বাধ্য হচ্ছেন শিক্ষার মান সর্বাংশে না হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে অধোগামী। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সচেতন প্রতিটি শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষই হয়ত বিষয়টার ভয়াবহ দিক এবং এ থেকে পরিত্রাণের উপায় নিয়ে ভাবছেন। আপন অভিজ্ঞতার আলোকে এ প্রসঙ্গে কিছু কথা উপস্থাপনের তাগিদ অনুভব করছি।

মাধ্যমিক পর্যায়ে বর্তমানে যে পদ্ধতিতে শিক্ষাদান ও অর্জিত জ্ঞানের মূল্যায়ন করা হচ্ছে সে দিকটাতে প্রথমে দৃষ্টি দেয়া যাক। ৬ষ্ঠ থেকে দশম পর্যন্ত পাঁচটি ধাপ পেরিয়ে একজন শিক্ষার্থী যায় এস এস সি পর্যায়ে। ৬ষ্ঠ থেকে পরবর্তী ধাপগুলোতে যদি যথাযথ জ্ঞান নিয়ে শিক্ষার্থী ধাবিত হয় তাহলে এস এস সি পর্যায়ে একজন শিক্ষার্থী নিজস্ব তাগিদেই সদুপায়ে পরীক্ষা দেবে এবং আশামত ফল পাবে। অথচ বাস্তবে সর্বক্ষেত্রে না হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে শিক্ষাদান ও গ্রহণ প্রক্রিয়া হয়ে গেছে একেবারেই পোশাকী। বেসরকারী পর্যায়ে অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যেই রূপ নিয়েছে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে। যার বিরূপ প্রতিক্রিয়া বইতে হচ্ছে সমগ্র জাতিকে। শিক্ষাজীবনে অসদুপায়ে উত্তীর্ণ অধিকাংশ শিক্ষার্থী ব্যক্তি, সমাজ তথা রাষ্ট্রীয় জীবনে কতটুকু যোগ্যতা ও সততা দেখাতে সমর্থ হবে তা ভাববার বিষয়।

নামকরা কিছু মাধ্যমিক বিদ্যালয় যেখানে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে প্রকৃত মেধাবীদের স্থান দেয়া হয় তা বাদ দিলে অন্য অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে শিক্ষাদান ও গ্রহণ প্রক্রিয়া কিভাবে চলছে সেদিকে এবার নজর দেয়া যাক। প্রাথমিক পর্যায় থেকে অসন্তোষজনক জ্ঞান নিয়ে আসা অধিকাংশ শিক্ষার্থী আসছে মাধ্যমিক পর্যায়ে। ঢালাওভাবে ক্লাস পরিচালনার পর বছরে তিনটি পরীক্ষার সম্মুখীন হচ্ছে তারা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরীক্ষার ফলাফলের সাথে অর্জিত জ্ঞানের কোন সংগতি নেই। এমনকি বার্ষিক পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েও অনেকেই নির্বিঘ্নে চলে যাচ্ছে পরবর্তী শ্রেণীতে। সংক্ষেপে যাকে বলা যায় অটো-প্রমোশন ব্যবস্থা। এভাবে বেশ আরাম আয়েশেই দশম শ্রেণী পর্যন্ত গিয়ে এস এস সি-তে এসে স্বাভাবিক কারণেই তারা অসদুপায় অবলম্বন করছে। আর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ প্রক্রিয়া বেশ পারদর্শিতার সাথে সম্পাদন করছেন সংশ্লিষ্টরা। এই ক্ষতিকারক প্রক্রিয়া নির্বিঘ্নে তারা চালাতে পারছে শুধুমাত্র অভিভাবকদের অসচেতনার কারণেই। অধিকাংশ অভিভাবক খেয়াল দিচ্ছে তার সন্তান কত নম্বর পেল, কিন্তু কতটা সে জানল সেদিকে নয়। প্রশ্ন উঠতে পারে বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদ কি করছে? অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের ভূমিকা যথাযথ নয়। তারা যতটা না শিক্ষানুরাগী তার চেয়ে অনেক বেশি স্বার্থ উদ্ধার সচেতন। তাদের কর্মকান্ড শিক্ষক-শিক্ষিকার উপস্থিতি অনুপস্থিতি এবং অর্থনৈতিক দিকেই প্রায় সীমাবদ্ধ। কিন্তু শিক্ষাদান ও গ্রহণ প্রক্রিয়ার যথার্থ মূল্যায়ন যেটা প্রধান বিষয় হওয়া উচিত সেদিকে লক্ষ্য নেই। এটা হতে পারে অজ্ঞতা আবার অনেকক্ষেত্রে অজ্ঞাতকারণে এড়িয়ে যাওয়া। অথচ অভিভাবকমহল সন্তানকে বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে আশায় থাকে যথার্থ ফলাফলের। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অর্জিত জ্ঞান আর অর্জিত ফলাফলের মধ্যে থেকে যাচ্ছে আকাশ-পাতাল ব্যবধান।

এসব কারচুপি করার সুযোগ মেলে কিভাবে? সেদিকে এবার দৃষ্টি দেয়া যাক। অধিকাংশ শিক্ষক শিক্ষিকা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক স্বচ্ছলতাকে বিদ্যার্জনের চেয়েও অনেক বড় করে দেখছে। তাদের দৃষ্টিভঙ্গিটা এরকম যে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীর সংখ্যা যত বেশি হবে ততই লাভ। শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞানের মান যাই হোক একশ্রেণীতে ধরে রাখলে শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকের নিরুৎসাহিত হওয়ার আশংকা, যথাযথ ফলাফল না দেখতে পারলে শিক্ষক তথা প্রতিষ্ঠানের বদনাম হওয়ার আশংকা ইত্যাদি। একই শিক্ষক শ্রেণীতে এবং প্রাইভেটে দু'রকম শিক্ষা দিচ্ছেন। অনেক ক্ষেত্রেই তিনি শিক্ষার্থীকে প্রাইভেট পড়তে বাধ্য করার জন্য শ্রেণীতে যথার্থ পাঠদান করছেন না। প্রাইভেটের প্রতি ছাত্রদের আকৃষ্ট করার জন্য পরীক্ষার হলে আসন ব্যবস্থা, পরিদর্শন কার্যক্রম যেমন উত্তর বলে দেয়া, অসদুপায়ের সুযোগ দেয়া। এমনকি অনেকক্ষেত্রে আগাম প্রশ্ন জানিয়ে দিতেও দ্বিধা করছেন না। এমনি সব দুর্নীতির শিকার হচ্ছে অধিকাংশ শিক্ষার্থী। নিয়মিত শ্রেণী পাঠদানকে শিক্ষকও যেমন নিছক আনুষ্ঠানিকতা হিসেবে দেখছেন তেমনি শিক্ষার্থীও প্রাইভেটের ভরসায় নিয়মিত ক্লাস করাকে তেমন গুরুত্ব দিচ্ছে না। এসব ক্ষেত্রে পাঠদান প্রক্রিয়াটি কখনও দক্ষতার অভাবে আবার কখনও নেহায়েত খামখেয়ালীপনার কারণেই হেলা ফেলাভাবে সম্পাদিত হচ্ছে। অর্থাৎ শিক্ষার্থী বাধ্য হচ্ছে না বুঝে মুখস্থ করতে। কোন রকমে বিষয়বস্তু গলাধঃকরণ করে পরীক্ষার খাতায় উগড়ে দিতে পারলেই তার দায়িত্ব শেষ-এ ধরনের মনোভাব দাঁড়িয়ে গেছে অধিকাংশ শিক্ষার্থীর মোট কথা বিষয়গত জ্ঞান তাদের মাথায় না গিয়ে থাকছে বই খাতায়। পঠিত শ্রেণী থেকে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন না করেই সে পরবর্তী শ্রেণীতে যখন যাচ্ছে তখন স্বাভাবিক কারণেই সে লেখা পড়াকে ভয় পেয়ে শুধুই ফাঁকির রাস্তা খুঁজছে। এর সাথে যোগ হচ্ছে অধিকাংশ শিক্ষকের আন্তরিকতার অভাব। ফলে অবস্থাটা দাঁড়াচ্ছে কিরূপ তা সহজেই অনুমেয়। এতদসত্ত্বেও পরীক্ষাতে শিক্ষার্থী যেমন নম্বর পেতে আগ্রহী তেমনি শিক্ষকও আগ্রহী নম্বর দিতে কেননা উভয়কেই ন্যূনতম জবাবদিহি করতে হচ্ছে। এসব ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী কৃত্রিম নম্বর দিয়ে বুঝ দিচ্ছে তার অভিভাবককে আর অন্যদিকে শিক্ষক বুঝ দিচ্ছে কর্তৃপক্ষকে। এদের মানসিকতায় ঢুকে গেছে যেনতেন প্রকারে ভাল রেজাল্ট দখল করা। মাধ্যমিক ধাপে যারা সরাসরি সংশ্লিষ্ট আছেন তাদেরদকে এ সত্যটি খুটিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না। বর্তমানে মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীকে ক্যালকুলেটর ব্যবহারের সুযোগ দেয়া হচ্ছে যা শিক্ষার্থীর গণিতের শিক্ষার ভিত্তিকে দুর্বল করছে অথচ এতে মুনাফা লুটছে ক্যালকুলেটর আমদানিকারক, ব্যবসায়ী এবং কমিশন প্রাপ্তরা। মোট কথা এভাবেই অপবিত্র ও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে শিক্ষাদান এবং গ্রহণ নামক অতি পবিত্র প্রক্রিয়াটি।

এতো গেল বর্তমানে চলমান প্রক্রিয়ার অন্ধকার দিক। এখন দেখা যাক এ থেকে কিভাবে পরিত্রাণ পাওয়া যেতে পারে। বর্তমানে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে যে প্রক্রিয়ায় পাঠদান ও গ্রহণ প্রক্রিয়াটি চলছে তাকে এমনভাবে ঢেলে সাজাতে হবে যেন শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েই যথাযথ পাঠদান ও গ্রহণে বাধ্য হয়। এক্ষেত্রে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে।

প্রতিটি বেসরকারী বিদ্যালয়ে বছরে তিনটি পরীক্ষা হয় তা একই সময়ে একই প্রশ্নপত্রের সাহায্যে সম্পাদন করতে হবে। এ জন্য বিভাগওয়ারী একটি প্রশ্নপত্র প্রণয়ন কমিটি থাকতে হবে। এসব প্রশ্নপত্র জেলা শিক্ষা অফিসার কর্তৃক সীলগালা করে পরীক্ষার ঠিক আগে প্রতি বিদ্যালয়ে সরবরাহ করতে হবে। জেলা শিক্ষা অফিসার কর্তৃক স্থায়ীভাবে পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে শিক্ষার্থীদের আসন ব্যবস্থা, পরিদর্শক নিয়োগ ও উত্তরপত্র মূল্যায়নের জন্য পরীক্ষক নিয়োগ করতে হবে। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও সহপ্রধান শিক্ষক এবং অফিস সহকারী ব্যতীত অন্যদের পার্শ্ববর্তী বিদ্যালয়ে পরীক্ষা পরিচালনার জন্য আসন ব্যবস্থাপক, পরিদর্শক এবং পরীক্ষক হিসেবে নিয়োগ করতে হবে। অর্থাৎ যাকে বলা যেতে পারে সাময়িক বদলি ব্যবস্থা। নিয়োজিত পরীক্ষকবৃন্দ নির্ধারিত বিদ্যালয়ে ফলাফলের কপি অবশ্যই জেলা শিক্ষা অফিসারের নিকট প্রেরণ করবেন যাতে ফলাফলে কারচুপির অবকাশ না থাকে। এ থেকে জেলা শিক্ষা অফিসার তার আওতাধীন প্রতিটি বিদ্যালয়ের ফলাফল অবগত হবেন। পরীক্ষার ফলাফল সন্তোষজনক (শতকরা ৭০ থেকে ৭৫ ভাগ) না হলে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের সরকারী অনুদানের ব্যাপারে ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার ব্যাপারে যথাযথ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন বিভাগ ও মন্ত্রণালয়ে সুপারিশ করবেন। ওপরে উল্লেখিত পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণ প্রাথমিকভাবে শুধুমাত্র বাৎসরিক পরীক্ষাতে এবং পরবর্তীতে তা বছরের তিনটি অভ্যন্তরীণ পরীক্ষাতেই প্রয়োগ করা যেতে পারে। কোন বিদ্যালয় যাতে কোন অবস্থাতেই অটো প্রমোশনের মত ক্ষতিকারক ব্যবস্থা না নিতে পারে পরীক্ষার ফলাফলের নিরিখে জেলা শিক্ষা অফিসার কর্তৃক সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। এ ছাড়াও প্রতিটি বিদ্যালয় পাক্ষিকভাবে যাতে টিউটোরিয়াল পরীক্ষা নেয়া হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে প্রধান শিক্ষকের প্রতি নির্দেশ জারি করতে হবে। বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষার্থী সংখ্যার কোটা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে এবং তা যথাযথ পালিত হচ্ছে কিনা সেদিকে জেলা শিক্ষা অফিসার কর্তৃক নজর রাখতে হবে। আমাদের দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় মাধ্যমিক পর্যায়ে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রচলনে ভাল ফলাফল পাওয়া যেতে পারে। এতে করে অনেক শিক্ষার্থীই তাদের কর্মজীবনে লাভবান হবে।

আলোচিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করলে শিক্ষাদান ও গ্রহণ প্রক্রিয়ায় বর্তমানের চলতি কারচুপি বন্ধ হয়ে যাবে এবং শিক্ষক শ্রেণীতে যথাযথ পাঠদানে এবং শিক্ষার্থী যাতে পাঠগ্রহণে মনোযোগী হয় সেদিকে খেয়াল দিতে বাধ্য হবেন। প্রধান শিক্ষকসহ সংশ্লিষ্ট সবাই বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে শিক্ষাদান ও গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সফলতার দিকে অধিকতর তৎপর হবেন। এতে করে প্রতিটি শ্রেণী থেকে শিক্ষার্থী যথার্থ জ্ঞান নিয়ে উত্তীর্ণ হবে এবং যা পরবর্তী শ্রেণীতে শিক্ষার্থীকে মজবুত ভিত্তিতে দাঁড় করাবে এবং শিক্ষার্থীও শিক্ষা গ্রহণকে ভয় না করে উৎসাহিত হবে। বিদ্যালয়ের রুটিনে যে শিক্ষকের জন্য যে শ্রেণীতে যে বিষয়ে পাঠদান নির্দিষ্ট হয়েছে সে শ্রেণীতে সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক প্রাইভেট পড়াতে পারবেন না। এ ব্যাপারে প্রধান শিক্ষককে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য জেলা শিক্ষা অফিসার কর্তৃক নির্দেশ জারি করতে হবে এবং তা পালিত হচ্ছে কি না সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। এসব কার্যক্রম যথাযথভাবে পালনের জন্য জেলা শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্টাফ নিয়োগ করতে হবে। এত করে বেসরকারী শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারের অর্থ বিনিয়োগ সার্থক হবে।